icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

# স্বাস্থ্য সংলাপ

ISSN 1021-2078

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ১৫ ■ সংখ্যা ৩ ■ চৈত্র ১৪১৩

## ভিটামিন ডি নয়, ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত রিকেট রোগই বাংলাদেশে প্রকট

**এস কে রায়**
আইসিডিডিআর,বি
**সৈয়দা মাহে মুনীর**
আইসিডিডিআর,বি

বাংলাদেশে যেসব কারণে অনেক মানুষ মারাত্মক প্রতিবন্ধীত্বের শিকার হয় তার মধ্যে রিকেট রোগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিন এ-এর অভাবজনিত রাতকানা, লৌহের অভাবজনিত রক্তাল্পতা এবং আয়োডিনের অভাবজনিত গলগণ্ড রোগ সম্পর্কে দেশের সর্বস্তরের লোকই কম-বেশি অবগত। এসব রোগ প্রতিরোধের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। রিকেট রোগটি একই রকম গুরুত্ব দাবি করলেও এর প্রতিরোধ বা প্রতিকারের জন্য সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে কোনো উদ্যোগ নেই, এমনকি এই রোগটি সম্পর্কে কেউ তেমন অবগতও নন। অথচ এটি ক্রমে ক্রমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

রিকেট রোগে হাড় বেঁকে যায় যা বাড়ন্ত শিশুর দেহে খনিজ পদার্থের, বিশেষ করে ভিটামিন ডি অথবা ক্যালসিয়ামের অভাবে হয়ে থাকে। রিকেটের ফলে হাড়ে ব্যথা হয়, পায়ের বিকৃতি ঘটে, শিশুর বৃদ্ধি হ্রাস পায়, দাঁতের সমস্যা দেখা দেয়, পেশী ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অথবা হাড় নরম হয়ে সহজেই ভেঙে যেতে পারে। রিকেট রোগের কারণে পায়ের নিচের অংশ বিভিন্নভাবে বিকলাঙ্গ হতে পারে। তবে, রিকেটের প্রধান চারটি ধরন নিচের ছবিগুলোতে দেখানো হলো।

রিকেটের প্রধান কারণ হলো দেহে ক্যালসিয়াম অথবা ভিটামিন ডি-এর অভাব। খাদ্যে ক্যালসিয়ামের অভাব অথবা ভিটামিন ডি-এর অভাব হলে অথবা অপর্যাপ্ত সূর্যের আলো থেকে এই রোগ হতে পারে। এছাড়া, ফসফরাস ও ফ্লোরাইডের অভাব, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ এবং অপরিচ্ছন্নতা থেকেও এ-রোগ হতে পারে।

### ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত রিকেট

ক্যালসিয়াম দেহের হাড় শক্ত করে। দেহে যখন ক্যালসিয়ামের অভাব হয় তখন সেই অভাব পূরণের জন্য দেহযন্ত্র হাড়ে জমে-থাকা ক্যালসিয়াম রক্তে সরবরাহ করে। ফলে, হাড়ে ক্যালসিয়ামের অপর্যাপ্ততা দেখা দেয় ও হাড় নরম হয়ে যায়। এসময় যদি শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে তখন ঐ নরম হাড় শরীরের ভার বহন করতে না-পেরে ধীরে ধীরে বাঁকা হয়ে যায়।

### ভিটামিন ডি-এর অভাবজনিত রিকেট

সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে ত্বকে ভিটামিন ডি তৈরি হয়। ভিটামিন ডি যকৃত ও কিডনীতে বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা ঠিক রাখে। রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমে গেলে ভিটামিন ডি রক্তে ক্যালসিয়ামের সঠিক মাত্রা বজায় রাখার জন্য ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে রক্তে ক্যালসিয়ামের শোষণ বৃদ্ধি করে এবং হাড়ে জমাকৃত ক্যালসিয়াম পুনঃশোষণ করে রক্তে নিয়ে আসে। ফলে, হাড়ে ক্যালসিয়ামের অভাব দেখা দেয় ও হাড় নরম হয়ে যায় এবং রিকেট রোগের সৃষ্টি হয়।

যদিও ভিটামিন ডি-এর অভাবে রিকেট হতে পারে, বাংলাদেশে রিকেটের প্রধান কারণ হলো খাদ্যে ক্যালসিয়ামের অভাব। বাংলাদেশের গোটা জনসংখ্যার মধ্যেই ক্যালসিয়ামের অভাব রয়েছে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৫ বছরের কম-বয়সী একটি শিশু প্রতিদিন ১৬০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম গ্রহণ করে, যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রতিদিন ৫০০ থেকে ৮০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত ক্যালসিয়াম গ্রহণের মাত্রা নির্ধারণ করেছে।

হাঁটুর কাছ থেকে দুই পা
দুই দিকে বেঁকে যায়

পা ধনুকের মতো
বাঁকা হয়ে যায়

দুই পা একসাথে একই দিকে
অর্থাৎ ডানে বা বামে বেঁকে যায়

হাঁটুর কাছ থেকে দুই পা
সামনের দিকে বেঁকে যায়

### ভেতরের পাতায়

হিটস্ট্রোক ৩
সুস্থ দেহ ও মনের জন্য আয়োডিনযুক্ত লবণ ৪
চল্লিশোর্ধ বয়সের পরুষদের নীরব ঘাতক প্রোস্টেট ক্যান্সার ৬
রক্তস্বল্পতা বা অ্যানিমিয়া সম্পর্কে জ্ঞাতব্য ৮

icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, এইচআইভি/এইডস্, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাবিষয়ক কর্মকাঠামোও আইসিডিডিআর,বি'র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিস্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

## স্বাস্থ্য সংলাপ

**সম্পাদনা পরিষদ**

| | |
|---|---|
| প্রধান সম্পাদক | ডেভিড এ স্যাক |
| উপ-প্রধান সম্পাদক | প্রদীপ কুমার বর্ধন |
| ব্যবস্থাপনা সম্পাদক | এম শামসুল ইসলাম খান |
| সম্পাদক | এম এ রহিম |
| পৃষ্ঠাবিন্যাস | সৈয়দ হাসিবুল হাসান |
| কম্পোজ | হামিদা আক্তার |

**সদস্য**

আসেম আনসারী, রুখসানা গাজী, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ ইকবাল, মাসুমা আক্তার খানম, মোঃ আনিসুর রহমান, রুবহানা রকিব ও পিটার থর্প।

**কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন**

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্কুল গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা ব্যবস্থাপনা সম্পাদক বরাবর ইংরেজিতে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

**প্রকাশক**

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৮৮৬০৫২৩-৩২
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮১৯১৩৩, ৮৮২৩১১৬
ইমেইল: msik@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

**মুদ্রণ:** ডট নেট লিমিটেড, ফোন: (৮৮০২) ৯৫৬৩৫৭৮

## রিকেট রোগ নিশ্চিতভাবে চেনার উপায়

পাঁচ বছরের কম-বয়সী কোনো শিশুর ক্ষেত্রে নিচের লক্ষণগুলোর মধ্যে কমপক্ষে যেকোনো ৩টি থাকলেই রিকেট হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়:

১. শরীরের উচ্চতা স্বাভাবিকের চেয়ে কম হলে
২. কব্জির গিঁট বৃদ্ধি পেলে
৩. পা সামান্য বাঁকা হলে
৪. হাঁটার সময় পায়ে ব্যথা হলে
৫. বুকের পাঁজর উপরের দিকে বৃদ্ধি পেলে
৬. হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত সামনের দিকে বেঁকে গেলে

রিকেটে কব্জির গিঁট বৃদ্ধি পায়

বুকের পাঁজর উপরের দিকে বৃদ্ধি পায়

## রিকেট সনাক্ত করার উপায়

১. রিকেটের লক্ষণগুলো দেখে সনাক্ত করা
২. হাড়ের এক্স-রে করা
৩. রিকেট-আক্রান্ত শিশুর রক্তে প্যারাথাইরয়েড হরমোন ও অ্যালকালাইন ফসফেটেস-এর পরিমাণ বেড়ে যায় এবং ২৫ হাইড্রক্সি ভিটামিন ডি-এর পরিমাণ কমে যায়। রক্ত পরীক্ষা দ্বারা এসব পরিমাপ করা যায়।

সর্বপ্রথম ১৬০০ শতাব্দীতে ইউরোপে রিকেট রোগটি দেখা দেয়। গত তিন দশক ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রিকেটের খোঁজ পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া উপজেলায় সর্বপ্রথম রিকেট চোখে পড়ে ১৯৯১ সালের সাইক্লোনের পর।

## বাংলাদেশে রিকেটের অবস্থা

রিকেটের ওপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জরিপ চালানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল ২০০৪ সালে সার্ভ (Social Assistance and Rehabilitation for the Physically Vulnerable)-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের ৬টি বিভাগের ২৮টি উপজেলায় ১ থেকে ১৫ বছর-বয়সী ১০,০০৫ জন শিশুর ওপর জরিপ চালায়। এর মধ্যে ১৬টি উপজেলায় রিকেট রোগ ধরা পড়ে। সারা বাংলাদেশে রিকেট-আক্রান্ত লোকের শতকরা হার ০.১২ অর্থাৎ মোট ১,৮০,০০০ জন এবং পায়ের অন্যান্য বিকৃতি শতকরা ০.১৬ অর্থাৎ ২,৪০,০০০ জন শিশুর মধ্যে দেখা যায়। সবচেয়ে বেশি রিকেট-আক্রান্ত শিশু দেখা যায় চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে। চট্টগ্রামের কক্সবাজারে শতকরা ১.৪ ও চৌদ্দগ্রামে শতকরা ০.৮; সিলেটের শ্রীমঙ্গলে শতকরা ১.১৩ এবং হবিগঞ্জ ও ফেঞ্চুগঞ্জের উত্তরাংশে শতকরা ০.৫৫; রাজশাহীর নওগাঁ সদরে শতকরা ০.৫৮ এবং শাহজাদপুরে শতকরা ০.৫৬ জন রিকেট-আক্রান্ত শিশু রয়েছে। এছাড়াও, ২০০৬ সালে সার্ভ নামের প্রতিষ্ঠানটি কক্সবাজারের চকোরিয়া উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের ২৪টি গ্রামের ২৭,০০০ জনের ওপর জরিপ চালিয়ে শতকরা ৯ ভাগ অর্থাৎ মোট ২,৪৩০ জন রিকেট-আক্রান্ত শিশুর সন্ধান পায়। ধারণা করা হয় যে, উপকূলীয় এলাকায় (চকোরিয়াসহ কক্সবাজারে) রিকেটের প্রাদুর্ভাব বেশি। উপকূলীয় এলাকায় অতিমাত্রায় ঝড় ও ঢেউয়ের কারণে, লোনা-পানিতে চাষাবাদ করার ফলে জমিতে ক্যালসিয়ামের ঘনত্ব কমে যায়। এ-কারণে চকোরিয়ায় রিকেটের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। তবে, শুধু উপকূলীয় এলাকায় নয়, বর্তমানে দেশের সব জায়গাতেই রিকেট রোগী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

## রিকেট রোগের ভয়াবহতা

রিকেট-আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে অন্যান্য যেসব স্বাস্থ্যসমস্যা ও বিরূপ আর্থ-সামাজিক অবস্থা দেখা দিতে পারে তার কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. বেশি মাত্রায় সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়
২. উপার্জনহীন অবস্থায় অসহায় মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়
৩. সামাজিকভাবে অবহেলিত এবং বিবাহের সময় উপেক্ষিত হয়
৪. পরিবার ও সমাজের বোঝা হয়ে বেঁচে থাকে ও করুণার পাত্রে পরিণত হয়

৫. মারাত্মক মানসিক সমস্যায় ভোগে
৬. স্থায়ী পঙ্গুত্ব দেখা দেয় ও দিন-দিন কষ্টের মাত্রা বাড়ে
৭. জীবনে স্থবিরতা আসে

## রিকেটের চিকিৎসা

রিকেট রোগের চিকিৎসার জন্য সরকারিভাবে কোনো ব্যবস্থা বা চিকিৎসা কেন্দ্র এখনো স্থাপিত হয় নি। তবে, কক্সবাজারের চকোরিয়া উপজেলায় সার্ভ-পরিচালিত 'চকোরিয়া ডিজ্যাবিলিটি সেন্টার' নামের একটিমাত্র চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে যেখানে রিকেটের চিকিৎসা করা হয়। এখানে পায়ের বিকলাঙ্গতা সারিয়ে শত শত পঙ্গু শিশুকে স্বাভাবিক করে তোলা হচ্ছে। ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে অসংখ্য মানুষ রিকেটের চিকিৎসা নিতে সেখানে যাচ্ছে। যেসব উপায়ে রিকেটের চিকিৎসা করা হয় তার কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. পুষ্টিগত চিকিৎসা
২. মেডিকেল চিকিৎসা
৩. ব্রেস/বন্ধনী চিকিৎসা
৪. অস্ত্র চিকিৎসা

### পুষ্টিগত চিকিৎসা

পুষ্টিগত চিকিৎসায় রোগীর খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনা হয়। দৈনিক স্বাভাবিক আহারের সাথে ক্যালসিয়াম গ্রহণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ কিছু খাবারের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. ডাল, ঢেড়স, শিম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, কচুজাতীয় গাছ, কুমড়া ও বিভিন্ন রকম শাক প্রতিদিন ১ বাটি করে খেলে ১৫০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। তেঁতুলেও বেশ পরিমাণে ক্যালসিয়াম রয়েছে
২. কাঁটাঅলা ছোট মাছ প্রতি ২ দিনে ১ বাটি করে খেলে ২,০০০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়
৩. দুধ বা দুগ্ধজাতীয় খাদ্য প্রতিদিন ১ গ্লাস খেলে ১২০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়
৪. দুই চা-চামচ তিল পিষে খেলে ১২০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়
৫. রিকেট প্রতিরোধে একটি কার্যকর অষুধ হলো পানের সাথে ব্যবহৃত চুন। রান্নার সময় ১ কেজি চালে ২ চিমটি চুন মিশিয়ে ভাত রান্না করা হলে রিকেট-আক্রান্ত শিশুই শুধু নয়, পরিবারের সকলেই খেতে পারবে এবং ক্যালসিয়ামের অভাব দূর হবে। এতে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ সর্বমোট ৩০০ মি.গ্রা.।

বাংলাদেশে এক গবেষণায় দেখা গেছে, ২-৪ বছর-বয়সী রিকেট-আক্রান্ত শিশুদের টানা ৩ বছর পুষ্টিগত চিকিৎসা দেওয়ার পর শতকরা ৬৬ ভাগ শিশুর বিকলাঙ্গতা পরিবর্তিত হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় এসেছে এবং শতকরা ১৩ ভাগ শিশুর মধ্যে অবস্থার উন্নতি লক্ষ করা গেছে। রিকেট চিকিৎসার সকল পদ্ধতির মধ্যে এই পুষ্টিগত পদ্ধতিই হলো সবচেয়ে কার্যকর, কম খরচে সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি যা দ্রুত কাজ করে। ৬ বছরের কম-বয়সী মাঝারি পর্যায়ের পা-বাঁকা (১৬ ডিগ্রি থেকে ২০ ডিগ্রি) শিশুদের ১ বছরের মধ্যেই শতকরা ৯০ ভাগ শিশুর আরোগ্য সম্ভব।

### মেডিক্যাল চিকিৎসা

মেডিকেল পদ্ধতিতে দৈনিক ১,০০০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট ১ বছরের জন্য খাওয়ানো হয়। চকোরিয়ায় ১৯৩টি রিকেট-আক্রান্ত শিশুকে ১ বছর ধরে ১,০০০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম দ্বারা চিকিৎসা করে দেখা গেছে, শতকরা ৭৫ ভাগ শিশু আরোগ্য লাভ করেছে। রিকেট রোগের অবস্থা যদি মারাত্মক হয়ে থাকে অর্থাৎ পা-বাঁকার পরিমাণ যদি ৪০ ডিগ্রির চেয়েও বেশি হয়ে থাকে, তবুও এর পুরোপুরি চিকিৎসা এ-পদ্ধতি দ্বারা সম্ভব। তবে, শিশুর বয়স ৬ বছরের নিচে হতে হবে। শিশুর বয়স ৬ বছরের বেশি হলে আরোগ্য লাভের মাত্রা হ্রাস পায় এবং ১২ বছরের বেশি হলে মেডিকেল পদ্ধতি দ্বারা কোনোরকম চিকিৎসাই সম্ভব নয়।

### ব্রেস/বন্ধনী চিকিৎসা

ব্রেস বা বন্ধনী পদ্ধতিতে কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লোহার ব্রেস বা বন্ধনী পরিয়ে দেওয়া হয় এবং এর সাথে সাথে পুষ্টিগত ও মেডিকেল চিকিৎসাও দেওয়া হয়। যখন মেডিকেল চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য লাভ সম্ভব হয় না তখন ব্রেস ব্যবহার করা হয়। এছাড়া, রোগীর বয়স ৬ থেকে ১২ বছর হলে এবং পায়ের বক্রতার পরিমাণ ১৫ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রি হলে এ-পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ব্রেস পদ্ধতি দ্বারা শতকরা ৮০ ভাগ রোগীর সফল আরোগ্য লাভ সম্ভব।

ধাতুর তৈরি ব্রেস বা বন্ধনী লাগিয়ে রিকেট-আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক বিকৃতি সারানো যায়

### অস্ত্র চিকিৎসা

অস্ত্র চিকিৎসা কেবলমাত্র মারাত্মক বিকৃতির (৩০ ডিগ্রির বেশি) ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যখন ১ বছরের মেডিক্যাল চিকিৎসা দ্বারাও অবস্থার কোনো উন্নতি হয় না। এ-পদ্ধতি দ্বারা শতকরা ৬০ ভাগ শিশু পুরোপুরি আরোগ্য লাভ করে এবং শতকরা ১৫ ভাগ শিশুর বিকৃত অবস্থার উন্নতি সম্ভব হয়। তবে, শতকরা ১০ ভাগ শিশুর ক্ষেত্রে অপারেশন-পরবর্তী জটিলতা দেখা দিতে পারে।

## রিকেট প্রতিরোধ

রিকেট রোগ প্রতিরোধের জন্য খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনতে হবে। দৈনিক ২৫০ মি.গ্রা ক্যালসিয়াম খেলে রিকেট প্রতিরোধ সম্ভব। এজন্য সরকারিভাবে জাতীয় রিকেটনীতি ঘোষণা ও বাস্ড়বায়ন করতে হবে। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের জন্য রিকেট-সংক্রান্ত সকল জ্ঞান ও তথ্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতির অন্তর্গত পুষ্টিবিষয়ক শিক্ষায় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। রিকেট সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে এবং ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষক ও ইমামসহ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সকল প্রতিষ্ঠানে রিকেট-সংক্রান্ত তথ্য ছড়িয়ে দিতে হবে।

রিকেট প্রতিরোধে কোনো জরুরী উদ্যোগ নেওয়া না হলে আজকের শিশু যারা আগামী দিনের ভবিষ্যত নাগরিক তাদের শারীরিক অক্ষমতা ও মারাত্মক বিকলাঙ্গতার কারণে সমাজের বিশাল বোঝায় পরিণত হবে এবং দেশ পশ্চাদগামিতার শিকার হবে।

*বিশেষ দ্রষ্টব্য: এ-লেখায় ব্যবহৃত সবগুলো ছবিই এসএআরপিভি থেকে প্রাপ্ত* ■

# হিটস্ট্রোক

**শাহরিয়া হাফিজ কাকন**
**আইসিডিডিআর,বি**

মানুষের শরীরে প্রাকৃতিকভাবেই রয়েছে এক ধরনের ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা, কিন্তু অতিরিক্ত গরমে বেশি কাজ করলে এই দৈহিক সিস্টেম বা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এরকম হলে শরীরের তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে। একে হিট অ্যাগজশন বলে। অবস্থা আরও খারাপ হলে জীবন শঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে। এ-অবস্থার নাম হিটস্ট্রোক।

## কিভাবে বুঝবেন আপনি হিট অ্যাগজশনে আক্রান্ত

- ত্বক ঠাণ্ডা, স্যাতস্যাতে ও ফ্যাকাশে হয়ে যায়

- প্রথমে অতিরিক্ত ঘাম হয় এবং জিহ্বা ও মুখ-গহ্বর শুকিয়ে যায়
- শরীর দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়ে
- মাথা ঘোরে, মাথাব্যথা হয়, বমি-বমি ভাব, এমনকি বমিও হতে পারে
- শরীরের তাপমাত্রা ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা তার উপরে হয়
- ত্বক অত্যন্ত গরম, লালচে ও শুস্ক হয়ে যায়
- স্ট্রোক হয়ে গেলে আর কোনো ঘাম হয় না
- দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস হতে থাকে
- নাড়ির স্পন্দন দ্রুত হতে থাকে
- চোখের মণির ভিতর গোলাকার কালো অংশ বা পিউপিল বড় হয়ে যায়
- দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে রোগী প্রলাপ বকতে থাকে
- খিঁচুনি হতে পারে
- রোগী জ্ঞান হারাতে পারে

কাপড়ে বরফ পেচিয়ে ঘাড় ও কোমরের দুইপাশে দিয়ে রাখতে হবে এবং ক্রমাগত বাতাস দিতে হবে

## প্রতিরোধের উপায়

- গরম এবং বদ্ধ জায়গায় থাকবেন না
- গ্রীষ্মকালে ব্যায়াম করলে খুব ভোরে বা সুর্যাস্তের পর সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য করুন
- হালকা ঢিলেঢালা সূতির পোশাক ব্যবহার করুন
- মাথায় ক্যাপ বা টুপি ব্যবহার করতে পারেন
- শরীর থেকে বেরিয়ে-যাওয়া পানি পূরণের জন্য প্রচুর পানি ও তরল পানীয় খান, তবে একসঙ্গে বেশি না-খেয়ে অল্প-অল্প করে বারবার খান
- আধা-গ্লাস পানিতে ১ টেবিল চামচ লবণ গুলিয়ে পান করতে পারেন
- ঘরের দরজা-জানালা খুলে বাতাস ঢুকতে দিন
- বিদ্যুৎ থাকলে ফ্যান বা এয়ারকুলার চালাতে পারেন অথবা হাতপাখা দিয়ে বাতাস দিতে হবে
- গরম পানিতে বেশিক্ষণ গোসল করবেন না
- এসময়ে চা, কফি ও অ্যালকোহল পান করা এড়িয়ে চলুন
- অন্য কোনো অসুখের জন্য যেসব অষুধ এসময়ে ব্যবহার করছেন তা আবার ডাক্তারকে দেখিয়ে নিন
- শিশুরা গরম সহ্য করতে পারে না। তাদের পোষাক ও তরল খাবার খাওয়ানোর দিকে লক্ষ রাখুন

## কখন রোগীকে হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যাবেন

- শরীরের তাপমাত্রা ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট-এর উপরে হলে
- ঘামহীন দেহ শুষ্ক হয়ে গেলে
- শুস্ক ও গরম ত্বক লালচে হয়ে গেলে
- খিঁচুনিসহ রোগী অজ্ঞান হয়ে গেলে

সারা বিশ্বে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে এখন আগের চেয়ে বেশি গরম পড়ে। গ্রীষ্মকালে হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি এড়ানোর জন্য সহনীয় তাপমাত্রায় কাজ ক'রে, হেঁটে বা ব্যায়াম করে নিজেকে এই সম্ভাব্য বিপর্যয় থেকে মুক্ত রাখুন। ■

# সুস্থ দেহ ও মনের জন্য আয়োডিনযুক্ত লবণ

**রীপা জামাল**
ইনস্টিটিউট অব নিউট্রিশন এণ্ড ফুড সায়েন্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
**মোঃ ইকবাল**
আইসিডিডিআর,বি

একটি দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে সে-দেশের জনগণের সঠিক মেধাশক্তি এবং কর্মদক্ষতার ওপর। সুস্থ-সবল ও মেধাবী মানুষের সংখ্যাধিক্যের কারণেই গড়ে উঠতে পারে একটি সমৃদ্ধ দেশ। আয়োডিনের অভাবে বাংলাদেশের জনগণের এক বিপুল অংশ শারীরিক ও মানসিকভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে অসমর্থ। শুধুমাত্র আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যাপক প্রচলনই পারে বিপুল জনশক্তিকে একই সঙ্গে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাখতে; এতে মানুষের কর্মদক্ষতা ও চিন্তাশক্তি বাড়বে। ফলে, দেশের অর্থনৈতিক উৎপাদনেও গতির সঞ্চার হবে।

## আয়োডিন কী

আয়োডিন মানবদেহের জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি রাসায়নিক উপাদান। বিশেষত মস্তিস্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য এবং তা কার্যকর রাখার জন্য মানবদেহে আয়োডিন দরকার। শরীরে থাইরয়েড হরমোন তৈরির জন্য আয়োডিন প্রয়োজন। থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের মাধ্যমে থাইরয়েড হরমোন তৈরি হয়। গলার সামনের দিকে প্রজাপতির আকারে এই গ্ল্যান্ড অবস্থিত। থাইরয়েড হরমোন রক্তের মাধ্যমে চলাচল ক'রে দেহের বিভিন্ন অংশের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানবদেহে যখন যথেষ্ট পরিমাণে আয়োডিন না-থাকে তখন প্রয়োজনীয় থাইরয়েড হরমোন তৈরি হতে পারে না। তখন আয়োডিনের অভাবে নানা রকম অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। শরীরের তাপরক্ষা ঠিকমত হয় না। সাধারণভাবে বলা যায়, আয়োডিন একটি পুষ্টি উপাদান যা আমাদের শরীরে অতি সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হলেও এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এর অভাবে গলাফোলা রোগ (যাকে গলগণ্ড বা ঘ্যাগ বলা হয়), মেধাহীনতা, বামনত্ব ও বধিরতা দেখা দেয়। শরীরে আয়োডিনের অভাবে মানুষ বোবা ও ট্যারা হতে পারে, কথাবার্তায় তোতলানো, ইত্যাদি স্বাস্থ্যসমস্যা দেখা দেয়। শিশুর চিন্তাশক্তি ও মেধা স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয় না। গর্ভাবস্থায় শিশুর মৃত্যুও হতে পারে।

## বাংলাদেশে আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা

বাংলাদশের শতকরা প্রায় ৭০ জন মানুষের মধ্যে আয়োডিনের অভাব রয়েছে। প্রায় ১ কোটি মানুষ

দৃশ্যমান ও ৪ কোটি মানুষ অদৃশ্যমান গলগণ্ড বা ঘ্যাগে আক্রান্ত। ৫ লক্ষ লোক মারাত্মক শারীরিক বিকলাঙ্গতা নিয়ে মানসিক প্রতিবন্ধীত্বের শিকার হয়ে বেঁচে আছে। ধনী-গরীব, গ্রামবাসী-শহরবাসী শিক্ষিত-অশিক্ষিত যেকোনো মানুষের আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে। বাংলাদেশের সর্বত্রই খাদ্যসামগ্রীতে আয়োডিনের কম-বেশি ঘাটতি রয়েছে। তাই আমরা কেউই বিপদমুক্ত নই। শিশু ও মহিলারা এ-সমস্যায় জর্জরিত। আয়োডিনের এই অভাবজনিত ভয়াবহ সমস্যাগুলো এড়ানোর একমাত্র উপায় যথেষ্ট পরিমাণে আয়োডিন গ্রহণ করা।

## কীভাবে আমরা প্রয়োজনীয় মাত্রায় আয়োডিন পেতে পারি

আয়োডিনের অভাব পূরণের অন্যতম উপায় হচ্ছে খাবারে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করা। এর কোনো বিকল্প নেই। তাছাড়া, সমুদ্রের মাছ ও সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত খাদ্য থেকেও আমরা যথেষ্ট পরিমাণে আয়োডিন পেতে পারি।

আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণের শারীরিক ও মানসিক ইতিবাচক দিকগুলো আমাদের সুস্পষ্টভাবে জানা দরকার।

শরীরে আয়োডিনের ঘাটতির একটি স্পষ্ট লক্ষণ হলো গলাফোলা বা গলগণ্ড রোগ

### আয়োডিনযুক্ত লবণ খেলে গলাফোলা রোগ হবে না

স্বাভাবিক আকারের চাইতে বড় থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থাকলে তাকে গলগণ্ড বা গলাফোলা রোগ বলা হয়। শরীরে আয়োডিনের ঘাটতির একটি স্পষ্ট লক্ষণ হলো গলাফোলা। আয়োডিনের অভাবে এই লক্ষণটিই সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান হয়, কারণ আয়োডিনের অভাবে শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে থাইরয়েড হরমোন তৈরি হয় না।

### হাইপোথাইরয়ডিজম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে

শরীর যখন যথেষ্ট পরিমাণে থাইরয়েড হরমোন পায় না তখন সেই অবস্থাকে হাইপোথাইরয়-ডিজম বলা হয়। এর উপসর্গগুলো হলো: কুঁড়েমি, নিদ্রাহীনতা, চামড়া শুকনো হয়ে-যাওয়া এবং ঠাণ্ডা সহ্য করতে না-পারা। খুব ছোট শিশুরা এর ফলে মানসিক প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ে। এই ক্ষতি কোনোভাবেই পূরণ করা যায় না। অনেক সময় মানসিক প্রতিবন্ধীত্ব খুবই মারাত্মক হয়ে থাকে, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি এত মৃদু হয় যে, খুব সুক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ না-করলে বোঝা যায় না, যেমন কোনো কোনো শিশু দেখতে-শুনতে স্বাভাবিক হয়, কিন্তু কাজে বা পড়াশুনায় মনোযোগ দিতে পারে না বা খুবই ধীর গতিতে কাজ করে। এটি যে আয়োডিনের অভাবের কারণে হয়েছে তা তার মা-বাবা বুঝতেই পারেন না।

### ক্রেটিনিজম (হাবাগোবা হওয়া ও বামনত্ব) বধিরতা, ট্যারাদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা কমবে

হাবাগোবা মানুষদের মারাত্মক শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীত্ব রয়েছে। এর সাথে তারা বোবা-কালা এবং বামনও হয়ে থাকে। যখন একজন গর্ভবতী মহিলা আয়োডিনের প্রকট অভাবে ভোগেন তখন তিনি হাবাগোবা সন্তানের জন্ম দেন। ভ্রূণের বৃদ্ধির বিশেষ পর্যায়ে যথেষ্ট পরিমাণে আয়োডিন না-পেলে শিশুর মস্তিস্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে থাকে। সুতরাং গর্ভাবস্থায় ভ্রূণে আয়োডিনের অভাব পূরণ হলে শিশুর শারীরিক ও মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ হওয়ার ভয় থাকবে না এবং গর্ভাবস্থায় শিশুমৃত্যুর হারও হ্রাস পাবে।

আয়োডিনের ঘাটতি থাকলে সাধারণত শরীর বেঁটে ও চেহারা হাবাগোবা হয় এবং আক্রান্ত ব্যক্তি তোতলিয়ে কথা বলে

### প্রজনন সমস্যা দূরীভূত হবে

যেসব মহিলার আয়োডিন ঘাটতি আছে তাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য মহিলাদের চেয়ে বেশি গর্ভপাতের ঝুঁকি থাকে ও তারা মৃত শিশুও জন্ম দেয়। বেশিরভাগ মহিলাই বুঝতে পারেন না যে, আয়োডিনের অভাবই এর মূল কারণ।

### শিশুমৃত্যুর হার কমবে

আয়োডিনের অভাবে শিশুমৃত্যুর হার বেড়ে যায়। আয়োডিনের অভাবগ্রস্ত শিশুরা অন্যান্য শিশুদের চেয়ে বেশি মাত্রায় অপুষ্টির সমস্যায় ভোগে এবং তাদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। আয়োডিনযুক্ত লবণ খেলে শিশুর বোধশক্তি ও মেধার স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে। আয়োডিনের অভাবজনিত এলাকায় যেসব শিশুর আয়োডিনের অভাব রয়েছে তারা সঠিক পরিমাণে আয়োডিনযুক্ত লবণ খেলে তাদের মেধা ও বুদ্ধি (আইকিউ) ১০ পয়েন্ট বেড়ে যায়।

### কর্ম-উদ্দীপনা বেড়ে যাবে

আয়োডিনযুক্ত লবণ খেলে সব বয়সের মানুষেরই কর্ম-উদ্দীপনা বেড়ে যায় এবং এরা প্রাণোচ্ছল থাকে। মানুষের স্বাভাবিক শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে।

## কী মাত্রায় আয়োডিন প্রয়োজন

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য গড়ে প্রতিদিন ১৫০ মাইক্রোগ্রাম আয়োডিনের দরকার হয়। গর্ভকালীন ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের প্রতিদিন ২০০ মাইক্রোগ্রাম, ছোট বাচ্চাদের ১২০ মাইক্রোগ্রাম, এবং অপেক্ষাকৃত বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৯০ মাইক্রোগ্রাম আয়োডিন লাগে।

আয়োডিন প্রাকৃতিকভাবে মাটি ও পানিতে পাওয়া যায়। যেসব প্রাণী ও উদ্ভিদ মাটিতে উৎপাদিত খাদ্য খায় তাদের মাধ্যমেও মানুষ আয়োডিন পায়, কিন্তু বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রচুর বৃষ্টিপাত ও বন্যার ফলে মাটি থেকে এই আয়োডিন ধুয়ে চলে যাচ্ছে। ফলে, আমাদের খাদ্যে আয়োডিনের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। যদি এ-দেশে আয়োডিনের ঘাটতিজনিত সমস্যার সমাধান করতে হয়, তাহলে আমাদের খাদ্যে অবশ্যই বাড়তি আয়োডিন গ্রহণ করতে হবে। এর সবচেয়ে সহজ পথই হলো খাবারের লবণকে আয়োডিনযুক্ত করা। আয়োডিন কখনো শরীরে বেশি পরিমাণে সংরক্ষণ করে রাখা যায় না। তাই নিয়মিত এবং অল্প পরিমাণে আয়োডিন গ্রহণ করতে হবে। শরীরের পক্ষে বেশি পরিমাণে আয়োডিন ধরে রাখা সম্ভব নয় বলে প্রয়োজনের

অতিরিক্ত আয়োডিন গ্রহণ করলেও তা প্রস্রাবের সাথে শরীর থেকে বের হয়ে যায়।

## আয়োডিনযুক্ত লবণের মান নিয়ন্ত্রণ

আর্দ্রতা এবং সূর্যের আলোর প্রতি আয়োডিন সহজে ক্রিয়াশীল। এতে লবণে আয়োডিনের পরিমাণ কমে যেতে পারে। এর অর্থ হলো: লবণ সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ ও প্যাকেট করতে হবে এবং উৎপাদক থেকে গ্রহণকারী পর্যন্ত সকল স্তরে নিয়মিতভাবে আয়োডিনের পরিমাণ পরীক্ষা করতে হবে। লবণে আয়োডিনের পরিমাণ পরীক্ষা করে দেখার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে মাঠকর্মীরা আয়োডিন পরীক্ষা-কিট ব্যবহার করবেন। বাড়িতেও নিজে-নিজেই লবণে আয়োডিনের উপস্থিতি পরীক্ষা করা যায়। ভাতের সাথে লবণ মিশিয়ে তাতে সামান্য ক'ফোটা লেবুর রস দিলে যদি ভাতের রঙ বেগুনী হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে লবণে আয়োডিন আছে।

যেভাবে আমরা সাধারণ লবণ গ্রহণ করি, ঠিক সেভাবেই আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণ করতে হবে—অর্থাৎ এই লবণ রান্নায় এবং খাবারে ব্যবহার করতে হবে। আয়োডিনযুক্ত লবণ কাচের বয়াম, মাটি বা প্লাস্টিকের পাত্রে ঢেকে রাখতে হবে। এই লবণ রোদে কিংবা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় রাখলে আয়োডিনের পরিমাণ কমে যেতে পারে। লবণ ধুয়ে নিলেও তাতে আয়োডিন থাকে না। তাই কেনার সময় অবশ্যই আয়োডিনযুক্ত লবণের প্রতীকচিহ্ন দেখে কিনতে হবে।

আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যাপকভাবে প্রচলনের স্বার্থে সরকার ইতোমধ্যেই প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করেছে। বর্তমানে দেশে সমস্ত ভোজ্য লবণে আয়োডিনযুক্তকরণ বাধ্যতামুলক। আইনের প্রয়োগ যথাযথভাবে হচ্ছে কি না কিংবা আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার বাড়ছে কি না সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় এ-বিষয়ে যেমন লক্ষ রাখতে পারে, তেমনি আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে কি না এ-বিষয়েও উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

## উপসংহার

লবণশিল্পে আয়োডিনের সঠিক মাত্রা রক্ষার বিষয়টিকে আমাদের গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত পর্যায়েও পর্যাপ্ত আয়োডিনযুক্ত লবণ আমাদের খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে আমাদের দেহের চাহিদামাফিক লবণ ও আয়োডিনের পরিমাণ ঠিক থাকে। এভাবে আয়োডিনযুক্ত লবণের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে এর অভাবজনিত রোগগুলো এড়ানো যায় এবং এতে মেধাসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বাড়িয়ে একটা উন্নত জাতি গঠনও সম্ভব। ■

# চল্লিশোর্ধ বয়সের পুরুষদের নীরব ঘাতক প্রোস্টেট ক্যান্সার

**কাজী রফিকুল আবেদীন**
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি
**আনোয়ারুল ইকবাল**
আইসিডিডিআর,বি
**তাহ্‌মিনা শিরীন**
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস

জীবনের ৪০ বছর পার হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেক পুরুষকেই কিছু শারীরিক বিষয়ে সতর্ক হতে হয়। এর অন্যতম হচ্ছে প্রোস্টেট গ্রন্থির সমস্যা। পরুষের যেসব অঙ্গের সমস্যা বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শুরু হয়, প্রোস্টেট গ্রন্থির অসুস্থতা তার অন্যতম। প্রোস্টেট গ্রন্থির প্রদাহ, প্রোস্টেট গ্রন্থি স্ফীত-হওয়া, প্রোস্টেট গ্রন্থির ক্যান্সার—এসবের যেকোনো অসুস্থতাতেই আপনি আক্রান্ত হতে পারেন। তবে এতে ভীত হবার কিছু নেই। বর্তমানে এসব রোগের প্রয়োজনীয় সকল চিকিৎসাই রয়েছে এবং আমাদের দেশেই এ-চিকিৎসা সম্ভব। এক্ষেত্রে যে-বিষয়টি অতীব জরুরী তা হচ্ছে: সঠিক সময়ে ও প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয়, সঠিক চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। তাহলে আপনার সুস্থ জীবনযাপন নিশ্চিত হতে পারে।

## প্রোস্টেট গ্রন্থি কী

পুরুষ মানুষের পেটের নিচের অংশে, প্রস্রাবের থলির ঠিক নিচে অবস্থিত একটি ছোট্ট গ্রন্থির নাম প্রোস্টেট গ্রন্থি। এ-গ্রন্থিটি পুরুষ প্রজননতন্ত্রের একটি অংশ। মহিলাদের কোনো প্রোস্টেট গ্রন্থি নেই। পুরুষের বীর্যের একটি বড় অংশই হচ্ছে প্রোস্টেট গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস। প্রোস্টেট গ্রন্থিটি প্রস্রাবের নালীর প্রাথমিক অংশের চতুর্দিক ঘিরে থাকে। শতকরা ৫০ ভাগ পুরুষই ৫০ বছর বয়স পেরিয়ে অনুভব করতে শুরু করেন: প্রস্রাবের গতি ঠিক আগের মতো নেই, ক্রমান্বয়ে কমে আসছে, ঘন ঘন প্রস্রাব করতে হচ্ছে, প্রস্রাব করতে সময় বেশি লাগছে, প্রস্রাবের বেগ হলে ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছে, দ্রুত মুত্র ত্যাগ করতে যেতে হচ্ছে, এবং কখনো কখনো সামান্য প্রস্রাব কাপড়েই পড়ে যাচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রস্রাব করাই অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। এসবই ঘটে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে প্রোস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি বা অসুস্থতাজনিত কারণে। এ-সমস্যার সিংহভাগই ঘটে প্রোস্টেট গ্রন্থি স্ফীত-হওয়া বা benign hypertrophy-এর কারণে। অনেক পুরুষের ক্ষেত্রে এসব সমস্যা বা কোনো লক্ষণ ছাড়াও প্রোস্টেট গ্রন্থিতে ক্যান্সার নামক ঘাতকব্যাধির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। আমাদের দেশে এ-বিষয়ে এখনো পর্যন্ত উল্লেখ করার মতো বিশ্বাসযোগ্য কোনো তথ্যভিত্তিক উপাত্ত নেই। তাই বলা কঠিন কতজন পুরুষ মানুষ আমাদের দেশে প্রোস্টেট ক্যান্সারে ভুগছেন। তবে সারা বিশ্বে পুরুষদের ক্যান্সারের মধ্যে প্রোস্টেট ক্যান্সারের প্রাধান্য হচ্ছে ২য় স্থানে—অর্থাৎ ফুসফুসের ক্যান্সারের পরেই। আমেরিকাতে পঞ্চাশোর্ধ বয়সের পুরুষদের মধ্যে ১০৩ জনে ১ জন, আর ৮০ বছর বা এর বেশি বয়সের পুরুষদের প্রতি ৮ জনে ১ জন প্রোস্টেট ক্যান্সারে ভুগছেন। আমাদের দেশের চিত্র সামান্য ভিন্ন হলেও এর সাথে বিরাট পার্থক্য হওয়ার সম্ভাবনা কম।

## প্রোস্টেট ক্যান্সার কী

ক্যান্সার বা ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হচ্ছে শরীরের কোনো অংশের বা অঙ্গের কিছু কোষের এমন পরিবর্তন যেখানে কোষগুলো স্বাধীন ও স্বনিয়ন্ত্রিতভাবে বিভাজিত হতে থাকে এবং সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকে; শরীরের অন্য অংশে বা অঙ্গসমূহে এই কোষসমুহের ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা

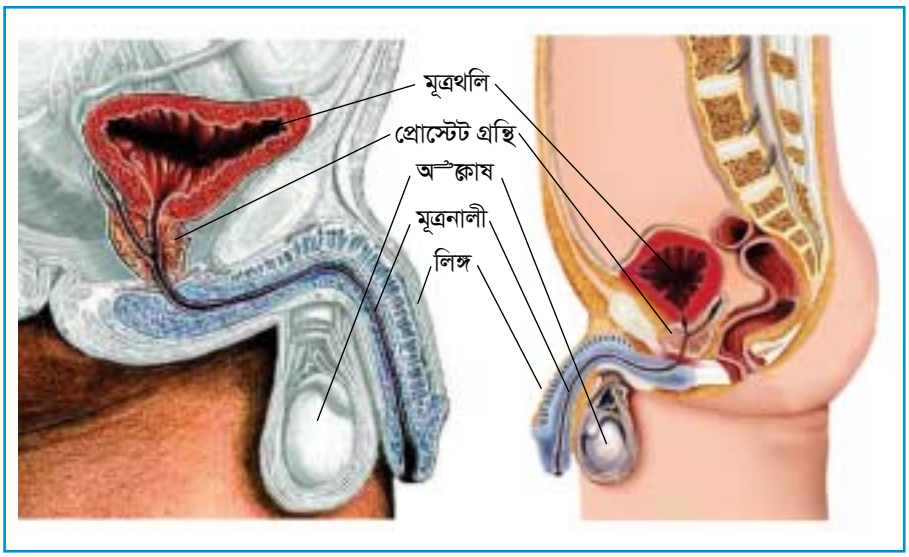

থাকে। স্বাভাবিকভাবে শরীরের যেকোনো কোষের বিভাজন ও বৃদ্ধি আমাদের শরীর প্রাকৃতিকভাবেই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এ-নিয়ন্ত্রণ থাকে না। প্রোস্টেট ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। প্রোস্টেট গ্রন্থির কোনো অংশের কোষগুলো দ্রুত ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিভাজিত হয় ও সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন, সংখ্যাবৃদ্ধি, দ্রুত শরীরের বিভিন্ন অংশে এর বিস্তৃতি এবং এই কোষসমুহ থেকে নিঃসৃত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ রোগের লক্ষণ সৃষ্টি করে। সংখ্যায় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রোস্টেট গ্রন্থি স্ফীত হতে পারে, প্রস্রাবের প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করতে পারে, খুব ছোট টিউমার ও কোনো লক্ষণ সৃষ্টির আগেই শরীরের অন্য অংশে ছড়িয়ে যেতে পারে। এর সবই হতে পারে অকল্পনীয় ঝুঁকির কারণ।

## বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে প্রোস্টেট ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব

আমাদের দেশে তথ্য-উপাত্ত না-থাকায় নিশ্চিত করে বলা কঠিন প্রোস্টেট ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব কতটা প্রকট। তবে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের মতামত হচ্ছে: প্রোস্টেট ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যা আমাদের দেশেও কম নয়। আর এ-দেশে রোগনির্ণয় পদ্ধতি বর্তমানে উন্নত হওয়ায় এর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ইউরোপ-আমেরিকায় পুরুষদের ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে প্রোস্টেট ক্যান্সার। সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে দেখা গেছে, এশিয়াবাসীদের মধ্যেও ক্রমান্বয়ে এ-রোগের প্রবণতা বাড়ছে।

## প্রোস্টেট ক্যান্সারের কারণ কী

প্রোস্টেট ক্যান্সারের সুনির্দিষ্ট কারণ নির্ণয় এখনো সম্ভব হয় নি। তবে কতগুলো বিষয় লক্ষ করা গেছে যেগুলো প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়; এসবকে বিপদের কারণ (risk factor) হিসেবে মনে করা হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- বয়স যত বেশি হয় প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি তত বেশি
- পরিবারে বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রোস্টেট ক্যান্সারের ইতিহাস থাকলে এ-রোগের ঝুঁকি বাড়ায় অর্থাৎ প্রোস্টেট ক্যান্সারের কিছু বংশ-গত (genetic) কারণও আজকাল আলোচিত হচ্ছে
- প্রোস্টেট ক্যান্সার প্রতিরোধ করে এমনসব খাবার খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়া, জীবনাচার পরিবর্তন, এবং আমাদের পরিবেশের কতিপয় গুণগত পরিবর্তন
- প্রোস্টেট গ্রন্থির প্রদাহ এবং এজন্য যথাযথ চিকিৎসা না-করা
- খাদ্যতালিকায় অতিরিক্ত চর্বি ও আমিষজাতীয় খাবারের সংযোজন, সিগারেট ও তামাক সেবন
- পুরুষ হরমোন (testosterone)-এর উপস্থিতি প্রোস্টেট ক্যান্সারের দ্রুত বৃদ্ধি ও বিস্তারে সাহায্য করে থাকে

## প্রোস্টেট ক্যান্সার নির্ণয় করার উপায় কী

যদি কোনো লক্ষণ দেখা দেয় বা রোগী তা অনু-ভব করেন তবে মূত্র-বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। পঞ্চাশোর্ধ বয়সের পুরুষের এবং চল্লিশোর্ধ বয়সের যেসব ঝুঁকিপূর্ণ পরুষের ক্ষেত্রে ক্যান্সারের পারিবারিক ইতিহাস রয়েছে তাদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় চিকিৎসক বিস্তারিত ইতিহাস জেনে, শারীরিক পরীক্ষা, বিশেষত মলদ্বারে প্রোস্টেট গ্রন্থির উপস্থিতি অনুভূত হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে, রক্তে prostate-specific antigen (PSA)-এর পরিমাণ নির্ণয় ক'রে প্রাথমিকভাবে রোগের উপস্থিতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন। প্রোস্টেট গ্রন্থি একধরনের জৈব পদার্থ তৈরি করে, যা আমাদের বীর্যে থাকে এবং আমাদের বীর্যে শুক্রাণূর স্বাভাবিক কর্মসাধনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। সুস্থ শারীরিক অবস্থায় এর খুব অল্প অংশই রক্তে আসে এবং রক্ত পরীক্ষা করে এর পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব। প্রোস্টেট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে রক্তে PSA-এর পরিমাণ বেশি পাওয়া যায়। অবশ্য রক্তে PSA-এর পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলেই প্রোস্টেট ক্যান্সার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না, কারণ প্রোস্টেট ক্যান্সার ছাড়াও আরো বেশকিছু কারণে রক্তে PSA-এর পরিমাণ বেশি হতে পারে, যেমন:

- সাধারণভাবে প্রোস্টেট স্ফীত-হওয়া বা be-nign hypertrophy
- প্রোস্টেটের প্রদাহ, প্রোস্টেটে পুঁজ জমা-হওয়া
- প্রোস্টেটে পাথর-হওয়া
- কোনো পরীক্ষা বা চিকিৎসা করতে গিয়ে যদি প্রোস্টেট গ্রন্থিকে নাড়াচাড়া করা হয় বা এর স্বাভাবিকতা নষ্ট করা হয়

এর অর্থ রক্তে PSA-এর পরিমাণ বেশি হওয়ার মানেই প্রোস্টেট ক্যান্সার নয়। প্রোস্টেট ক্যান্সারে রক্তে PSA-এর পরিমাণ বৃদ্ধি রোগটির অন্যতম কারণ, একমাত্র কারণ নয়। রক্তে PSA-এর পরিমাণ বেশি থাকলে এবং শারীরিক পরীক্ষায় অস্বাভাবিকতা দেখা গেলে আপনার চিকিৎসকের দায়িত্ব হবে প্রয়োজনীয় আরো কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রক্তে PSA-এর পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ খুঁজে বের করা এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

## রক্তে PSA-এর পরিমাণ বেশি হলে প্রোস্টেট ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য পরবর্তী করণীয় কী

প্রোস্টেট ক্যান্সার নিশ্চিত করে সনাক্তকরণের উপায় হচ্ছে: প্রোস্টেট বায়োপ্সি (biopsy)। আপনার চিকিৎসক আপনার রোগের ইতিহাস ও মলদ্বারে প্রোস্টেট পরীক্ষার তথ্য জেনে, রক্তে PSA-এর পরিমাণ, PSA বৃদ্ধির গতি, PSA-এর ঘনত্ব, মুক্ত ও সমগ্র PSA-এর অনুপাত (Free: Total PSA ratio), রক্তে PSA-এর পরিমাণ দ্বিগুণ হতে কতটা সময় নিচ্ছে (PSA-doubling time), ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে চিকিৎসক নির্ধারণ করবেন প্রোস্টেট বায়োপ্সি করতে হবে কি না—অর্থাৎ সূঁচের সাহায্যে প্রোস্টেট থেকে সামান্য অংশ নিয়ে পরীক্ষা করবেন কি না এবং কখন এটা করা সঠিক হবে।

## প্রোস্টেট ক্যান্সার প্রতিরোধযোগ্য কি না

প্রোস্টেট ক্যান্সারের সঠিক কারণ এখনও নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। তাই এ-রোগের প্রতিরোধ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা কঠিন। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে কিছু কিছু ঝুঁকির কারণ সম্পর্কে সতর্ক হলে বা এড়িয়ে চললে উপকার পাওয়া সম্ভব, যেমন:

- ধূমপান বর্জন
- চর্বি ও আমিষজাতীয় খাবার পরিমিতভাবে খাওয়া
- খাদ্যতালিকায় টমেটো, গাজর, তরমুজ ও সয়াবিনজাত খাদ্যের নিয়মিত সংযোজন
- ভিটামিন সি এবং ভিটামিন ডি-সমৃদ্ধ খাবার বা এর সম্পুরক খাবার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা
- প্রোস্টেট ক্যান্সারের পারিবারিক ইতিহাস থাকলে বয়স ৪০ বছর পেরুলে বা কোনো লক্ষণ অনুভব করলেই মূত্র-বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা করানো
- প্রোস্টেট গ্রন্থির প্রদাহ হলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা নেওয়া
- কোনো প্রয়োজনে শরীরের বাইরে থেকে পুরুষ হরমোন (testosterone) ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই যথাযথ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এ-জাতীয় হরমোন ব্যবহারের আগে আপনার প্রোস্টেট স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সঠিক ও সম্পূর্ণ ধারণা নেওয়া প্রয়োজন
- নিয়মিত ব্যায়াম করা

## প্রোস্টেট ক্যান্সার জীবনের জন্য কতটা ঝুঁকিপূর্ণ

প্রোস্টেট ক্যান্সার জীবনের জন্য অবশ্যই ঝুঁকিপূর্ণ। তবে এ-রোগ প্রাথমিক অবস্থায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শরীরের প্রতি খুব আক্রমণাত্মক নয়। প্রোস্টেট ক্যান্সার শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে খুবই ধীরগতিতে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। সমস্যাটা অন্যত্র, আর সেটি হচ্ছে প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ যখন চিকিৎসা হলে সর্বোত্তম ফল লাভ সম্ভব সে-অবস্থায় শতকরা ৬০-৭০ ভাগ রোগীরই কোনো শারীরিক লক্ষণ বা উপসর্গ থাকে না। সে-কারণে প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় কেবলমাত্র সম্ভব নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে। সঠিক সময়ে রোগ-নির্ণয়, যথাযথ ও সময়োচিত চিকিৎসা অতি জরুরী। অসম্পূর্ণ চিকিৎসা কিংবা অতিরিক্ত চিকিৎসা দু'টিই এড়িয়ে চলতে হবে। ■

# আইসিডিডিআর,বি স্টাফ ক্লিনিক থেকে

## রক্তস্বল্পতা বা অ্যানিমিয়া সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

অ্যানিমিয়া'র অর্থ রক্তশূন্যতা বা রক্তস্বল্পতা যাই বলা হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে এর কোনোটাই সঠিক নয়। কারণ একজন বয়স্ক সুস্থ মানুষের শরীরে মোট যে-পরিমাণ (প্রায় ৫ লিটার) রক্ত থাকে, অ্যানিমিয়া হলে সেই রক্তের পরিমাণ কমে না, কেবল রক্তে হিমোগেণ্ঢাবিন বা লাল-কণিকার পরিমাণ কমে যায়। একজন বয়স্ক পুরুষের রক্তে প্রায় ১৪.৮ গ্রাম/১০০ মি.লি. এবং একজন বয়স্ক মহিলার রক্তে প্রায় ১৩.৭ গ্রাম/১০০ মি.লি. হিমোগেণ্ঢাবিন থাকে। রক্তের সেই হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়াকেই রক্তস্বল্পতা বলা হয়। এর সঙ্গে রক্তের লোহিত কণিকার সংখ্যাও কমে যেতে পারে। রক্তস্বল্পতা একটি অতি সাধারণ স্বাস্থ্যসমস্যা। কিন্তু যদি এর সুচিকিৎসা না-করা হয় তবে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়ে মানুষের মৃত্যুও হতে পারে।

রক্তের হিমোগ্লোবিন তৈরিতে যে-উপাদানটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো লৌহ। আমাদের শরীরে প্রায় ৪.৫ গ্রাম লৌহ থাকে। তার মধ্যে ২.৫ গ্রাম থাকে হিমোগ্লোবিনের মধ্যে আর বাকিটা থাকে বিভিন্ন টিস্যুতে। একজন সুস্থ মানুষের জন্য দৈনিক ১ মি.গ্রা. লৌহের প্রয়োজন। কারণ শরীর থেকে প্রতিদিন প্রায় ১ মি.গ্রা. লৌহ বেরিয়ে যায়। এই ১ মি.গ্রা. লৌহ পেতে আমাদের দৈনন্দিন খাবারের মধ্যে পুরুষদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫ মি.গ্রা. এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ৭ মি.গ্রা লৌহ থাকা প্রয়োজন। লৌহ ছাড়াও ফলিক এসিড এবং ভিটামিন বি১২-এর অভাবেও রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়। শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হলে শরীরের অভ্যন্তরে লোহিত কণিকা নষ্ট হয়ে কিংবা অন্য অনেক উপায়েও রক্তস্বল্পতা দেখা দিতে পারে।

আমরা প্রতিনিয়ত শ্বাসের সঙ্গে যে-অক্সিজেন নিচ্ছি তা রক্তের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন টিস্যুতে ছড়িয়ে পড়ে। রক্তের হিমোগ্লোবিন এই কাজটি করে থাকে। স্বভাবতই যাদের শরীরে হিমোগেণ্ঢাবিন কম, তাদের বিভিন্ন টিস্যুতে অক্সিজেন কম পৌঁছায়। ফলে, তাদের নানাবিধ উপসর্গ দেখা দেয়। আমাদের খাদ্যাভ্যাস, পুষ্টিজ্ঞানের অভাব, স্বাস্থ্য সম্পর্কে অসচেতনতা, কুসংস্কার, কৃমি সংক্রমণ, ইত্যাদির কারণে এ-দেশে অনেকেই, বিশেষত শিশু ও মহিলারা রক্তস্বল্পতায় ভোগে। তবে মেয়েদের বেলায় মাসিকের সময় বেশি রক্ত-যাওয়া, ঘনঘন গর্ভধারণ এবং প্রসবকালীন রক্তক্ষরণও এর অন্যতম কারণ। অথচ আমরা যদি স্বাস্থ্যসচেতন হই, পুষ্টিকর সুষম খাবার খাই, তাহলেই রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ করতে পারি।

### *রক্তস্বল্পতার উপসর্গ*

- খুব দুর্বলতা বোধ করা/বুক ধড়ফড়-করা
- মাথাঘোরা ও ঝিমঝিম-করা
- খাবারে অরুচি
- অল্প পরিশ্রমে ক্লান্তি বোধ-করা ও বেশি মাত্রায় ঘাম-হওয়া
- হাত-পা জ্বালাপোড়া ও ঝিমঝিম-করা
- বসা থেকে দাঁড়ালে চোখে অন্ধকার দেখা

### *রক্তস্বল্পতার লক্ষণ*

- ফ্যাকাসে চেহারা
- চোখের নিচের পাতায় কনজাংটাইভা সাদা দেখানো

- জিহ্বা, ঠোঁট ও হাতের তালু ফ্যাকাসে দেখানো
- নখ সাদা-হওয়া ও মাঝখানে একটু নীচু-হওয়া
- শিশুদের ক্ষেত্রে মাথা ঘামা

### *যেসব খাবারে লৌহ-উপাদান বেশি থাকে*

- কলিজা
- ডিম
- মাংস
- বরবটি
- মটরশুটি
- সীমের বীচি
- কচু শাক
- পালং শাক
- লাল শাক
- পুঁই শাক
- কলা

### *যা যা করবেন*

- রক্তক্ষরণ হয় এমন রোগ, যেমন দাঁতের মাড়ীর রোগ, অর্শ, পেপটিক আলসার থাকলে বা মাসিকের সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে তা সারিয়ে ফেলবেন
- পেটে কৃমি থাকলে তার জন্য চিকিৎসা নেবেন
- দীর্ঘদিনের প্রদাহ/জীবাণুর সংক্রমণ থাকলে তার জন্য সঠিক চিকিৎসা নেবেন
- উন্নত মানের ক্লিনিকে/হাসপাতালে সন্তান প্রসবের কাজটি সম্পন্ন করবেন
- দুই সন্তানের জন্মের মাঝে ৪-৫ বছর ব্যবধান রাখবেন

### *যা যা করবেন না*

- ঘনঘন সন্তান এবং দুই-এর অধিক সন্তান নেবেন না
- কখনো হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসা নেবেন না
- যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করবেন না
- মাঠে-ঘাটে খালি পায়ে হাঁটবেন না

### *যা যা খাবেন*

- পুষ্টিকর সুষম খাবার খাবেন
- যেসব খাবারে লৌহ-উপাদান বেশি আছে সেসব খাবার খাবেন। মহিলা ও শিশুদের ক্ষেত্রে এসব খাবার বেশি পরিমাণে খেতে হবে
- চিকিৎসকের পরামর্শমত অষুধ খাবেন
- গর্ভকালীন সময়ে ও সন্তান প্রসবের পর মহিলাদের আয়রন টেবলেট ও ফলিক এসিড খাওয়া উচিত
- পাঁচ মাস বয়স থেকে শিশুকে শক্ত খাবার খাওয়াবেন

### *যা খাবেন না*

যাদের পেপটিক আলসার আছে তারা চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত বাতের ব্যথার উপশমকারী অষুধ খাবেন না ■

**ডাঃ এম মতিউর রহমান**